সম্পদ ব্যবহারে স্থানীয় সংগঠন, যৌথমুখীনতা ও সম্পৃক্ত পরিকল্পনা

ডঃ শেখ মাকসুদ আলী

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় অনুন্নত দেশগুলির সম্পদ সাধারণতঃ সীমিত বলে ধরা হয় এবং বলা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে এসব দেশে স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিভাবে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকরী সংগঠন গড়ে তোলা যায় এবং এই সব স্থানীয় সংগঠন কিভাবে সম্পদ সৃষ্টি ও তার সুষ্ঠু ব্যবহারে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এ বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এই বিতর্কের একটি দিক হলো ঃ

১। এসব স্থানীয় সংগঠন কারা সৃষ্টি করবে ? এগুলো কি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে, না স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে উঠবে। যদি এগুলো দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গড়ে উঠে তবে এগুলো কি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠবে, না অরাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সমাজ কর্মীদের মাধ্যমে গড়ে উঠবে ?

২। এসব সংগঠনের দায়িত্ব কি হবে এবং কারা তার দায়িত্ব তালিকা ঠিক করবে ? এসব দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা কোথা থেকে আসবে ? সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে এরা কার কাছে জবাবদিহি করবে ? সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য এদের কারা এবং কিভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করবে ?

৩। দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় 'সম্পদ' এরা কোথা থেকে পাবে ? যদি সম্পদের একটা অংশ সংগঠনের বাইরে থেকে আসে তবে সম্পদ-দাতার সঙ্গে তার ব্যবহারিক ও নিয়ন্ত্রণগত সম্পর্ক কি হবে ?

এসব প্রশ্ন জটিল। এ প্রশ্নগুলি জটিলতর হয়ে উঠে যখন 'সম্পদ' ও 'সংগঠন' বলতে আমরা যা কিছু বুঝি তাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

অনুন্নত দেশে সম্পদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ এসব দেশে উন্নয়ন ধ্যান-ধারণা প্রধানতঃ বিদেশ থেকে আসে।

পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক দেশের আমদানীকৃত গতানুগতিক সংজ্ঞায় সাধারণতঃ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুঁজি গঠনের (ক্যাপিটাল ফরমেশন) উপর জোর দেওয়া হয়। বলা হয় যে পুঁজি গঠন প্রক্রিয়ায় দুইটি দিক রয়েছে। (ক) সঞ্চয় ও (খ) তার সঠিক বিনিয়োগ। দেখানো হয় যে যেহেতু অনুন্নত দেশে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা কম সুতরাং তার আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ক্ষমতাও কম। এ অবস্থায় বিনিয়োগ বাড়াতে হলে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এসব দেশগুলোকে উন্নত দেশ থেকে ঋণ করে বিনিয়োগ হার বাড়াতে হবে।

এ অর্থনৈতিক থিওরী অনুযায়ী বিগত তিন দশক ধরে অনুন্নত দেশগুলোর অধিকাংশ উন্নত দেশগুলো থেকে ক্রমাগত টাকা ধার করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব বার্ষিক সঞ্চয় মোট জাতীয় আয়ের ৫% এর নীচে এবং বিনিয়োগ হার সে তুলনায় প্রায় ১৬%। স্বভাবতঃই বাকী টাকাটা বাইরে থেকে ধার করতে হয়। এই বিনিয়োগে আমাদের বাৎসরিক নীট প্রবৃদ্ধি মাত্র ১% থেকে ২% এর মত। যদি এই প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে হয় তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ঋণের বোঝা আরও বাড়বে।

আমাদের আমদানীকৃত উপরোক্ত ধ্যান-ধারণাসমূহ আরও জটিল হয়ে উঠে যখন আমরা দেখি যে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য আমরা ক্রমাগত আমাদের ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছি কিন্তু আমাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার আকাঙ্ক্ষিতভাবে না বেড়ে প্রতি বছরে আমাদের ঋণের বোঝাটাই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? যারা আমাদের ঋণ দিচ্ছেন তারা এ জন্য আমাদেরই দায়ী করছেন? বলছেন যে এসব ঋণের সাহায্যে যে সব প্রকল্প তারা আমাদের তৈরী করে দিচ্ছেন বা তৈরী করতে আমাদের সাহায্য করছেন সে সব প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অথবা সদিচ্ছা আমাদের নেই।

বৈদেশিক ঋণপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাই অনুন্নত দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করতে হয়। আমাদের দেশে ১৯৫০ দশকে এই সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে। ঋণের বোঝা বৃদ্ধি ও প্রকল্পের সমস্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্প্রসারণ ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে প্রায় সমান ভাবেই চলতে থাকে। তদুপরি এই সম্প্রসারিত প্রশাসন কাঠামোকে দক্ষ করে তোলার জন্য প্রধানতঃ বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যারা প্রশিক্ষণ দেবেন তাদের উপযুক্ত করে গড়ার জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের কাজের ভার লাঘব করার জন্য নানা আকৃতি-প্রকৃতির 'প্রশিক্ষণ মডিউল' পর্যন্ত করে দেওয়া হয়।

যে সব অর্থনীতিতে প্রগতির হার কম সেখানে সাধারণতঃ অর্থনীতিবিদদের দাপট বেশী দেখা যায়। এসব দেশে বৈদেশিক ঋণ আসলে পরিকল্পনা কমিশনের সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি ঘটে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে। বিশ্বব্যাংকের মত অন্যসব

আন্তর্জাতিক সংস্থা এইসব পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানকে সুদক্ষ করার জোর চেষ্টা চালিয়ে যান, ফলে আমদানীকৃত নানাবিধ উন্নয়ন মডেলে দেশ ভরে যায়। এইসব মডেলকে কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমা ধাঁচে গবেষণা ও সেই সঙ্গে জন্ম হয় একটি নূতন শ্রেণীর, যারা গবেষণা ও মূল্যায়ন 'বিশেষজ্ঞ' বলে নিজেদের দাবী করেন।

এইসব গবেষণা ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য অনুন্নত দেশের মত বাংলাদেশেও অনেক মূল্যবান অবদান রেখে চলেছেন। এক্ষেত্রেও বৈদেশিক ঋণ এইসব গবেষণা ও মূল্যায়ন সমীক্ষকদের অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে আমরা অনেক নূতন কথা ও সূরের সন্ধান পেয়েছি, যেমন---দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, অংশগ্রহণ মূলক পরিকল্পনা, মৌলিক চাহিদা ও তার সূচক ইত্যাদি।

এসব উপাদেয় কথামালার উজ্জ্বলতায় অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র মানুষেরা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের জন্য যেটা দরকার তা হচ্ছে আত্মনির্ভরশীল সংগঠন, পরনির্ভরশীল কথা নয়। আত্মনির্ভরশীল একটা অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে সাংগঠনিক আত্মবিশ্বাসেই কথা বলবে এবং কাজের মধ্যে এ আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাবে। আমি প্রায় ৭ বছর আগে কিছু প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তারদের এমন একটা গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলাম যেখানে মানুষ কাজ করছে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধানের চেষ্টা করছে। ডাক্তার সাহেবেরা যখন জানলেন যে এ গ্রামে দরিদ্রতা দূর করার কিছু চেষ্টা হয়েছে তখন তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে তারা 'দারিদ্রের' কোন 'সংজ্ঞা' ব্যবহার করছেন? প্রত্যুত্তরে গ্রামবাসীরা জানতে চাইলেন 'সংজ্ঞা' জিনিসটা আসলে কি? গ্রামবাসীদের যখন বোঝানো হলো 'সংজ্ঞা' কি তখন তারা বললেন ঐ জিনিসটা তাদের খুব বেশী দরকার নেই, কারণ তাদের গ্রামে কাদের সত্যিকার অর্থে কি ধরণের সাহায্য দরকার সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবেই তাদের জ্ঞান রয়েছে। এরপর আলোচনা যে ভাবে চল্লো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দিচ্ছি ঃ

প্রঃ আপনারা আপনাদের গ্রামের দরিদ্রদের জন্য কি করেছেন?

উঃ আমরা এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে একখণ্ড জমি নিয়ে তা চাষের জন্য বিতরণ করেছি।

প্রঃ কিন্তু যে ভাল চাষ জানে না তাকে জমি দিয়ে কি হবে?

উঃ ভাল চাষী নয় এমন কাউকে তো আমরা জমি চাষ করতে দেই নাই।

প্রঃ যারা ভাল চাষী নয় তাদের জন্য কি করেছেন?

উঃ তাঁদের আমরা মাছ চাষের একটা খাস পুকুর বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।

প্রঃ কিন্তু মাছ চাষ থেকে আয় করতে হলে বছর দুই সময় দরকার। এই সময় তারা কি খাবে?

উঃ মাছ চাষের সময় খাওয়া-দাওয়ার সামর্থ একেবারেই যাদের নেই তাদের তো আমরা পুকুর দেই নাই।

প্রঃ যাদের এখনই খাওয়া-দাওয়ার সামর্থ নেই, তাদের জন্য আপনারা কি দিয়েছেন?

উঃ তাঁদের আমরা রিক্‌সা ভাড়া করে দিয়েছি।

প্রঃ কিন্তু যাদের শারীরিক সামর্থ নেই তারা রিক্‌সা কি করে টানবে?

উঃ এরূপ লোকদের তো আমরা রিক্‌সা দেই নাই। এদের আমরা ঢাকা থেকে পুরানো কাপড় কিনে দিয়েছি। তারা এগুলি ধুয়ে পরিষ্কার ও ইস্ত্রী করে বিক্রি করছে।

আমাদের বুদ্ধিজীবিদের তাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধিশালী না হয়েও যে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের সমস্যা সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং সেসব সমস্যার বাস্তবানুরূপ সমাধান দিতে পারে উপরোক্ত কথাবার্তায় তার ইংগিত রয়েছে। আমরা ইচ্ছে করলে এ ধরনের বহু ইংগিত যে কোন গ্রামের আনাচে কানাচে পেতে পারি। কিন্তু পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে রংগীন চশমা আমরা শক্ত করে আমাদের চোখে পড়ে ফেলেছি তার কাঁচ ভেদ করে আমাদের নিজেদের গতিশীলতার সংবাদ পাওয়া খুব একটা সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের সমস্যা যদি আমাদের সঠিক ভাবে বুঝতে হয় তবে এ চশমা অবশ্যই খুলতে হবে। তখন আমরা দেখবো যে আমাদের সমস্যা প্রধানতঃ পুঁজি গঠন নয় এবং সেইজন্য আমাদের ঋণের বোঝার ক্রমবৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা নেই। আমাদের প্রধান সমস্যা আমাদের অগণিত মানুষের বিধিদত্ত বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও কর্মক্ষমতাকে সংগঠনের মাধ্যমে কাজে লাগানো ও কাজের মাধ্যমে তাকে বাড়িয়ে তোলা। অবশ্যই এ ধরণের কার্যক্রম আমাদের ঋণদাতাদের নিকট গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা কম কারণ তাতে তাদের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমে যাবে।

সুতরাং স্থানীয় পর্যায়ে যে সব সংগঠন আমরা গড়ে তুলতে যাচ্ছি তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের মানব সম্পদের উন্নয়ন, পশ্চিমা অর্থে বৈদেশিক ঋণের বোঝা ভারী করে পুঁজিগঠন নয়। বৈদেশিক পুঁজি সংগ্রহ না হলে আমাদের মানব সম্পদ উন্নত হবে না বা তার সুষ্ঠু ব্যবহার হবে না, একথা ঠিক নয়। বরং আমাদের মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্যেই আমাদের পুঁজি গঠনের সৃজন-শীলতা রয়েছে। আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা আমাদের মৌলিক চাহিদা মডেলের কথা বলছেন। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিল্প, স্বাস্থ্য সব কিছু দরকার কিন্তু পশ্চিমা বিশ্লেষণে যেহেতু আমাদের সম্পদ সীমিত সেহেতু এই সবগুলি আমাদের একত্রে পাওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রশ্ন উঠে। অথচ আমরা এ পর্যন্ত যে তিনটি পরিকল্পনা করেছি তাদের কোনটাতেই আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের মৌলিক চাহিদার অগ্রাধিকার ঠিক করতে পারি না। কখনও আমরা কৃষি, কখনও কর্মসংস্থান, কখনো অবকাঠামো, কখনো সবগুলোতে একই ঝুঁড়িতে রেখে অগ্রাধিকার দিয়েছি। ফলে, কোন ক্ষেত্রেই আমরা বড় রকমের সাফল্য আনতে পারি না। আমাদের এই বিফলতাকে সামনে রেখে

আমরা এমন একটি গ্রামের গ্রামকর্মীদের কাছে গেলাম যারা গ্রাম পর্যায়ে বেশ কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। আমরা তাদের বল্লাম যে, আপনারা কি ভাবে আপনাদের সমস্যা চিহ্নিত করছেন ও তাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করছেন? তাদের উত্তর ছিলো ঃ

"আমাদের দ্বিতীয় অগ্রাধিকার হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। প্রথম সমস্যাটি জটিল তাই আমরা পরে বলবো।"

আমাদের খাদ্য ঘাটতি আমরা জরীপের মাধ্যমে বের করেছি। গ্রাম পর্যায়ে জরীপ সঠিক হতে হবে।

আমাদের তৃতীয় সমস্যা জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। এর ফলে আমাদের খাদ্য ঘাটতি এক বছর কমালেও পরের বছর বেড়ে যায়। সুতরাং উন্নয়ন কার্যক্রমে আমাদের তৃতীয় অগ্রাধিকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তবে আমরা জানি যে আমাদের দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অবিলম্বে আশানুযায়ী সফল হবেনা। তাই খাদ্যের উৎপাদন আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরও উপরে বাড়াতে হবে। কৃষি উৎপাদনে আমাদের যে গতানুগতিক জ্ঞান রয়েছে তা নিয়ে কৃষির এই ধরণের প্রবৃদ্ধি সম্ভব হবে না। এজন্য দরকার কৃষি সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরণের জ্ঞান লাভ চাষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের চতুর্থ অগ্রাধিকার হবে 'ব্যবহারিক শিক্ষা', পুঁথিগত শিক্ষা নয়। আমাদের পঞ্চম অগ্রাধিকার বেকার মানুষের কর্ম-সংস্থান। এজন্য অকৃষি খাতে কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়াতে হবে। সেজন্য রিলিফ নয়, উৎপাদনমুখী ঋণ সহজ শর্তে সময়মত, যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া প্রয়োজন, তবে তা আসবে গ্রাম থেকে। এখন গ্রামের সঞ্চিত টাকা শহরে চলে যাচ্ছে।

আমাদের ষষ্ঠ অগ্রাধিকার সামাজিক ও যৌথ মূল্যবোধ। আমরা বর্তমানে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। এটা ঠিক নয়। গ্রামকে আত্মনির্ভরশীল করতে হলে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে যৌথমুখী হতে হবে। আমাদের শ্লোগান হবে আমাদের গ্রামে কেউ অভুক্ত থাকবে না। আমাদের সপ্তম অগ্রাধিকার গ্রামীণ কোন্দল ও দ্বন্দ্বের মীমাংসা। গ্রাম পর্যায়ে নিজেদের মধ্যে কিছুটা বিরোধ থাকা স্বাভাবিক তবে তা গ্রামীণ পর্যায়েই মীমাংসা হওয়া দরকার। সংগঠনের মাধ্যমে এই মীমাংসা সম্ভব। বস্তুতঃ গ্রামীণ কোন্দলের মীমাংসা ছাড়া কোন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্ভব নয়। তাই এই সপ্তম অগ্রাধিকার আসলে আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।

গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া এ ধরনের বিশ্লেষণ আমাদের বুদ্ধি সম্পর্কে আমাদের সন্দিহান করে দেয়। আমরা সারা বাংলাদেশের সার্বিক খাদ্য ঘাটতির নির্ভুল হিসাব দিতে পারি কিন্তু বাংলাদেশের কোন গ্রামে খাদ্য ঘাটতি ঠিক কতটুকু তা বলতে পারিনা। তবে আমরা খাদ্য ঘাটতির সার্বিক পরি-সংখ্যান কিভাবে পেলাম? আমরা কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের কথা বলছি কিন্তু আমাদের

উন্নয়ন কার্যক্রমে আমরা গ্রামকে দরিদ্রতর করে গড়ে তুলছি এবং ক্রমাগত ভাবে ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিক ব্যক্তি উদ্যোগকে প্রতিপালন করেছি। ফলে আমাদের শিল্প-পতিরা ও ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা লাভে ব্যস্ত। দরিদ্র জনসাধারণের খাওয়া-পরার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার সময় তাদের কোথায়? তাছাড়া ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিক উন্নয়ন পরস্পরের সঙ্গে ও সমাজের সঙ্গে তাদের বৈপরীত্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। নিজেদের কল্যাণ কামনায় তাই তাদের অনেকেই নিজেদের সন্তান সন্ততিদের দেশে নয়, বিদেশে মানুষ করছেন। এইসব বিদেশী বাংগালীরা কি বাংলাদেশের উপবাসী জনগণকে চিনতে পারবেন? তাদের ক্যালকুলেটারে আমাদের এসব সামাজিক বৈপরীত্য কি ধরা পড়ছে? বলা যেতে পারে যে আমাদের এই সামাজিক বিভ্রান্তি আসলে আমাদের রোগ নয়? রোগের লক্ষণ। আসল রোগ 'কাঠামোগত'। আমাদের সমাজের উৎপাদনের উপকরণ গুটি কতক লোকের হাতে সীমাবদ্ধ। এ কাঠামোগত ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে শুধু 'লক্ষণ' দেখে 'চিকিৎসা' চলবে না।

কথাটা অস্বীকার করছি না তবে কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা আমরা অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে বলে আসছি। কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন আসছে কই, প্রান্তিক পরিবর্তন ছাড়া? সেই জন্যেই কিছু কিছু গ্রাম রোগ নয়, 'লক্ষণের' উপর ভিত্তি করেই সংগঠনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পাচ্ছে। কোন সময়ে তারা আংশিক ভাবে পারছেন কোন সময়ে হারিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু গতিশীল প্রক্রিয়া চলছে। আমরা যদি কাঠামোগত পরিবর্তন না আনতে পারি তবে সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা কি এই গতিশীল প্রক্রিয়াকে অন্ততঃ আর একটু প্রাণবন্ত করতে পারবো?

বর্তমান কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জনসাধারণ কিভাবে কিছু কিছু গ্রামে নিজেদের কিছুটা সংগঠিত করে গ্রাম উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন, সেই গতিশীল প্রক্রিয়া বোঝার জন্য ১৯৮০ সালে আমরা ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। আমাদের অনুসন্ধানে আমরা দেখতে পাই যে অনুন্নয়নের সমুদ্রে যদি কোন গ্রাম আপন মহিমায় কিছুটা প্রদীপ্ত হয়ে উঠে তবে তার প্রধানতঃ তিনটি কারণ থাকে, প্রথমতঃ প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া যায় যে সে গ্রামে কিছু নিঃস্বার্থ সমাজ-কর্মী রয়েছে যারা এই উন্নয়ন কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশী উদ্যোগী ভূমিকা রেখেছেন তবে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সাধারণতঃ নিঃস্বার্থ সমাজ কর্মীদের কাজ করার সুযোগ কম কারণ উন্নয়ন কার্যক্রম যদি গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে সংগঠিত ও উন্নত করে তবে তা গতানুগতিক নেতৃত্বের কাছে সাধারণতঃ গ্রহণীয় হয় না। কারণ সংগঠিত জনগণ গতানুতিক নেতাদের নেতৃত্ব বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে চাইবেনা। সেই জন্য গ্রামের গতানুগতিক নেতৃত্ব দরিদ্র শ্রেণীকে সংগঠিত হতে দিতে চায় না। কাজেই সমাজ কর্মীদেরকে উন্নয়ন কার্যক্রম গতানুগতিক নেতৃত্বের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। এ সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে কোন গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে তবে বলতে হয় যে সেই গ্রামে এমন কিছু

সমাজকর্মী রয়েছেন যারা উন্নয়ন কার্যক্রমে গতানুগতিক নেতৃত্বের সমাজ বিরোধিতা কি করে কাটিয়ে উঠতে হয় তার কলা-কৌশল রপ্ত করেছেন। এই কলা-কৌশল রপ্ত করাই গ্রাম উন্নয়নের দ্বিতীয় কারণ। গ্রাম উন্নয়নের তৃতীয় কারণ হচ্ছে নিঃস্বার্থ সমাজ কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের সংযোগ। আমরা আমাদের অনুসন্ধানে দেখেছি যে সমাজ কর্মীরা গ্রামের গতানুগতিক নেতৃত্বের বাধা নিষেধ অতিক্রম করে গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিলেও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ উন্নয়ন কার্যক্রমে উপকরণ, উন্নত প্রযুক্তি এবং সহায়ক বুদ্ধি পরামর্শের দরকার। এসব জিনিস স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামগুলোর উন্নতি করতে হলে আমাদেরকে (১) ঐ সব গ্রামে নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের খুঁজে পেতে হবে এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে (২) সমাজ কর্মীদের শুধু উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করলেই চলবেনা তাদেরকে গতানুগতিক নেতৃত্বের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে উন্নয়ন কার্যক্রমে এগিয়ে যাবার কলাকৌশল শিক্ষা দিতে হবে, এবং (৩) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমাজকর্মীদের সংযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে যাতে উন্নয়ন কার্যক্রমে যে সব উপকরণ, প্রযুক্তি ও বুদ্ধি পরামর্শ প্রয়োজন সে সব যথামথভাবে সমাজকর্মীরা পেতে পারে। এই শেষের কাজটি হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন কারণ স্থানীয় প্রশাসনে যে সব সরকারী কর্মচারীরা রয়েছে তাদের অধিকাংশের সংযোগ গ্রামের নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের সাথে নেই বরং রয়েছে স্বার্থপর গতানুগতিক নেতৃত্বের সঙ্গে। এই সংযোগ অনেক সময় পরস্পরের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ এরূপ সংযোগে সরকারের কাছে থেকে পাওয়া অনুদানের একটি অংশ ভাগাভাগি করে নেবার সুযোগ থাকে। অনেক সময় আবার পরিবেশের চাপে এ ধরণের সংযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন হয়, না হলে স্থানীয় কর্মচারীরা গ্রাম অঞ্চলে টিকে থাকতে পারে না।

১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত বেশ কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারীদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের নিজ গ্রামে পাঠানো হয়, নিজেদের গ্রামগুলোকে উন্নত করার জন্য। প্রশিক্ষণের সময় তাদেরকে আমরা বলি যে তারা যেন তাদের গ্রামের নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের খুঁজে বের করে এবং এইসব নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের উন্নয়ন কার্যক্রমে বাধা বিপত্তি উত্তরণের কলা-কৌশল শিখিয়ে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদেরকে এইসব নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ করে দেয়, কিন্তু আমাদের এ প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি। কারণ (১) সরকারী কর্মচারীরা উন্নয়ন কার্যক্রমে সাধারণতঃ গতানুগতিক নেতৃত্বের উপরই নির্ভর করে এসেছে, নিঃস্বার্থ সমাজ কর্মীদের উপরে নয়; (২) নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীরা সাধারণতঃ উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হয় এবং এই কারণে পুনরায় উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে তাদের একটা স্বাভাবিক অনীহা রয়েছে; (৩) থানা পর্যায়ের অফিসাররা উন্নয়ন কার্যক্রমে গ্রামে আসতে সাধারণতঃ নারাজ, তারা চায় জনসাধারণ তাদের কাছে

আসুক। তাছাড়া থানা পর্যায়ে এইসব অফিসারদের সংযোগ গতানুগতিক নেতৃত্বের সঙ্গেই বেশী, নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীদের সাথে নয়।

নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী কারা? নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী হিসাবে আমরা যাদের পরিচয় পেয়েছি তারা সাধারণতঃ সেই সব পরিবার থেকে আসে যে সব পরিবারের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কিছুটা অতীত ট্রাডিসন ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। তা ছাড়াও তারা নিজে থেকেই সমাজকল্যাণে বেশ কিছুটা উদ্বুদ্ধ। তারা কেন সমাজের জন্য চিন্তা করে এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বলে যে তারা শুধু 'ব্যক্তিই নয় সামাজিক জীবও বটে'। ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ অবশ্যই তাদের কাজকর্ম প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তবে সামাজিক জীব হিসেবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও তারা বেশ কিছুটা সচেতন।

ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ বড় ধরণের দায়িত্ব পালন করতে পারে, তবে সে প্রশিক্ষণ গতানুগতিক ধরণের নয়। গতানুগতিক প্রশিক্ষণ পশ্চিমা চিন্তাবিদরা তাদের থলিতে করে অনুন্নত দেশের জন্য নিয়ে আসেন। তাদের চিন্তা ব্যক্তি স্বার্থের 'গতিশীলতায়' আচ্ছন্ন। এই গতিশীলতার ভিত্তি হচ্ছে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ জে,এস, মিলের "ইউটিলিটারিয়ান দর্শন"। এর মূল কথা হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনতে হলে ব্যক্তিকে ভয়ংকর স্বার্থপর হতে হবে। তবে যদি বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকে তবে এতে ভয় করার কিছুই নেই। বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সংঘাত বাজারের অদৃশ্য হাতের কলকাঠিতে সমাজে ভারসাম্য ও কল্যাণ নিয়ে আসবে।

পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এভাবে সামাজিক কল্যাণ আনতে পারবে, এ দাবী সমাজতন্ত্রীরা স্বীকার করে না বরং তারা বলে যে এ সমাজে সম্পদের মালিকানা যাদের হাতে তারা নিঃসহায়দের শোষণ করবে এবং সমাজে বৈপরীত্য বাড়বে। পশ্চিমের ধনতন্ত্রবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের মতপার্থক্য এতই বেশী যে সারা পৃথিবী এখন দুটো বড় ব্লকে ভাগ হয়ে মারনাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মারনাস্ত্র তৈরীতে এদের সম্মিলিত ব্যয় বর্তমানে ১০,০০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই ব্যয়ের যদি কিছুটাও পৃথিবীর দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় হতো তবে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যভাবে লেখা যেতো। কিন্তু তাদের জীবন দর্শনের রঙীন চশমা ছাড়া তারা পৃথিবীকে দেখবেনা, ফলে সারা পৃথিবী এখন ভীত, কোন মুহূর্তে তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, যখন মানুষও থাকবেনা সমাজে শক্তিরও প্রয়োজন হবে না।

মানুষকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে সমাজ সচেতনতা থাকা দরকার। সেই জন্যই নিঃস্বার্থ সমাজ কর্মীরা ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে 'যৌথ মূলবোধে' বেশী বিশ্বাসী। তারা মনে করে সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের প্রতি তাদের একটা কর্তব্য রয়েছে। যে সব গ্রামে সমাজকর্মীদের উদ্যোগে কিছুটা উন্নয়ন আসছে সেখানে আমরা এই যৌথমুখীনতার বহিঃপ্রকাশ দেখছি, যেমন বলা হচ্ছে

"আমাদের গ্রামে আমরা কাউকে অভুক্ত থাকতে দেবো না, কিন্তু কেউ বেকারও থাকতে পারবে না।"

এ ধরনের যৌথমুখী দর্শন ও কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা যখন কাজে নেমে পড়ে তখন তারা 'সমমনা' লোকদের খোঁজ করে। যেসব সংগঠনে এ ধরনের সমমনা লোকের সমাবেশ থাকে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সমাজকর্মীরা আকর্ষিত হয়। আবার এই ধরনের যৌথমুখী সংগঠন সমাজকর্মীদের সমাজ সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে। সুতরাং এ কার্যক্রম একটা বৃত্তকার চক্রে পরিবর্দ্ধিত হয়।

গতানুগতিক নেতৃত্বের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের পরিমাণ যৌথমুখীনতার তুলনায় বেশী। কাজেই তাদের পক্ষে নিঃস্বার্থ সমাজকর্মীর ভূমিকা পালন সাধারণতঃ সম্ভব নয়। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও সমাজ সচেতনতা ও যৌথমুখীনতা কম। তাছাড়া তারা নিজস্ব ডিপার্টমেন্ট কেন্দ্রিক। তারা তাদের মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও পরিদপ্তরের বাইরে বেশী কিছু ভাবতে পারে না এবং সে জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিভাগ, দপ্তর ও পরিদপ্তরের সাথেও তারা সাধারণতঃ ততটা সহযোগিতা করতে পারে না। এ জন্যই আমাদের প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সমন্বয়ের এত অভাব। তাছাড়া রয়েছে সরকারী কর্মচারীদের আত্ম-অহংকার। দরিদ্র জনগণের কাছে থেকে তারা বুদ্ধি নিতে সাধারণতঃ অনিচ্ছুক। বুদ্ধি ধার করতে তাদের অনেকের অবশ্য লজ্জা নেই, তবে সেটা বিদেশ থেকে। অন্যদিকে আমরা দেখছি যে পশ্চিমা ধ্যানধারনা সমাজতান্ত্রিক ও ধনবাদী দেশ সমূহের মধ্যেও সহযোগিতা ও সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারছে না। কাজেই প্রশ্ন উঠে তারা তাদের স্বার্থ কেন্দ্রিক দর্শন দিয়ে আমাদের গ্রামাঞ্চলে কি করে সমাজ সচেতনতা ও যৌথমুখীনতা সৃষ্টি করবে ?

আমরা কি আমাদের আত্মকেন্দ্রিক গতানুগতিক নেতৃত্বকে এবং আত্মগরিমায় অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রশাসনকে যৌথমুখী করতে পারবো ? আমরা আগেই বলেছি সঠিক প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে, তবে এ প্রশিক্ষণ সুবিক্ষণে অট্টালিকার প্রশিক্ষণ কক্ষে হবেনা এবং পশ্চিমা ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী প্রশিক্ষকদের দ্বারাও হবে না। এ প্রশিক্ষণ দেবে সেই সব সমাজকর্মীরা যারা 'সামাজিক জীব' হিসাবে উদ্বুদ্ধ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে গতানুগতিক নেতৃত্বের বিরোধিতা ও প্রশাসনিক অনীহাকে উত্তরণের কলা-কৌশল জানে এবং সে প্রশিক্ষণ হবে মাঠ পর্যায়ে, যৌথমুখী কার্যক্রমের কঠিন বাস্তবতায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমরা কি তাহলে আমাদের কার্যক্রমকে শুধু গ্রাম পর্যায়েই সীমিত রাখবো ? আমরা কি সমগ্র দেশের জন্য সংযুক্ত একটা উন্নয়ন মডেলের চিন্তা করবো না, যেখানে কৃষি ও শিল্প, গ্রাম ও শহর সমন্বিত ভাবে উন্নত হবে এবং একটা পরিবর্দ্ধিত অবকাঠামো এই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করবে ? অবশ্যই এ ধরনের সমন্বয় প্রয়োজন তবে আমরা মনে করি সামগ্রিক ভাবে একটা যৌথমুখী দর্শন যদি জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি না হয় তবে আমাদের ইপ্সিত সমন্বয় পরিকল্পনা প্রশিক্ষণের পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনার

পৃষ্ঠাগুলিতে এবং আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সমন্বয় কমিটির প্রতিবেদনের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে। কার্যকরী সমন্বয়ের জন্য আমাদের যৌথমুখীনতার মূল-মন্ত্র, আমাদের শহর ভিত্তিক সভ্যতাকে আমাদের গ্রামাঞ্চল থেকে শিখতে হবে। আগেই বলেছি আমরা যে গুটি কতক গ্রামে সফল উন্নয়ন কার্যক্রমের বিকাশ দেখেছি সেখানে উন্নয়নের দর্শনই হচ্ছে "আমরা আমাদের গ্রামের কাউকে অভুক্ত থাকতে দিবো না কিন্তু তাদের কেউ অলসও থাকতে পারবেনা।" এ জীবন দর্শন আমাদের জন্য অপরিচিত কিছু নয়, এ জীবন দর্শন এখনও আমাদের সমাজেই রয়েছে তবে তার খোঁজ করতে হলে সমাজের নীচুস্তরে নেমে যেতে হয়। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তবে এ যুক্তির সর্মথন পাওয়া যাবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সমাজের উচ্চতর অংশের অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে গ্রামে ঢুকে পড়েছিলেন। সেদিন যদি গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ তাদের নিজেদের খাদ্য ও শয্যা দিয়ে এইসব 'মুসাফিরদের' সাহায্য না করতো তবে স্বাধীনতার পরে তারা বীরদর্পে শহরে প্রত্যাবর্তন করতে পারতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় যখন ক্ষুধার্ত গ্রাম-বাসী দলে দলে শহরে ছুটে এসেছিলো তখন আমাদের আত্মকেন্দ্রিক উচ্চ ও মধ্যবিত্তরা কি তাদের চোখে দেখতে পেয়েছিলো ?

আমাদের গ্রামাঞ্চলে যদি এখনও কিছুটা যৌথমুখীনতা থেকে থাকে তবে আমরা কেন তাকে ব্যবহার করবো না ? যদি তা করতে হয় তবে গ্রামা-ঞ্চলে আমাদের সমাজকর্মীদের খুঁজে বের করতে হবে। এটাই হবে আমাদের পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রথম অধ্যায়। আমাদের মনোক্রী পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায় হবে এদের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে গ্রাম থেকে ইউনিয়নে এবং ইউনিয়ন থেকে উপজেলায় সমন্বিত করা এবং কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত অনুদান ও স্থানীয় পর্যায়ে সংগৃহীত সম্পদকে এই কার্যক্রমের জন্য ব্যয় করা। আমাদের পরিকল্পনার তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে আমাদের বর্তমান পরিকল্পনার ম্যাক্রো কাঠামোকে এই উদ্যোগের সাথে সমন্বয় করা।

আমাদের গতানুগতিক পরিকল্পনা "ইনপুট আউটপুটের" একটি অত্যন্ত দুর্বল ও ছেলেমানুষী কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই বাঁশের কেল্লা তৈরী করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অজস্র দেশী বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমৃদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু লাভ কি হয়েছে ? আগেই বলেছি আমাদের গতানুগতিক পরিকল্পনায় আমরা সারা দেশের ক্ষেত্রে কত খাদ্য, কত মৎস, কত হাঁস মুরগী, কত গরু ছাগল প্রয়োজন ও কত ঘাটতি সব নিঃখুত ভাবে বলে দিতে পারি, পারিনা শুধু কোন গ্রামে এসব জিনিসের কত ঘাটতি এবং কি করে এইসব ঘাটতি পূরণ করতে হবে তা বলে দিতে। ফলে আমাদের পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ও দেশে খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতি দুটিই স্ফীত হচ্ছে। আমরা যদি আমাদের গ্রাম পর্যায়ে সঠিক পরিসংখ্যান না জানি, তবে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের পরিসংখ্যান কিভাবে নিখুঁত হচ্ছে এটা জিজ্ঞেস করা কি অন্যায় ? আর জাতীয় পর্যায়ে পরিসংখ্যানে

যদি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তবে আমাদের পরিকল্পনার ম্যাক্রো কাঠামোর ইনপুট আউটপুট কো-ইফিসিয়ন্টগুলি কি দুর্বল হবে না ? এমন একটা অবকাঠামোকে কি আমরা বাঁশের কেল্লা বলবোনা ?

গতানুগতিক পরিকল্পনা কাঠামোয় আমরা বাঁশের কেল্লাটিকেই দেখি, মানুষকে দেখিনা। মানুষ দেখিনা বলে মানুষকে কি করে যৌথমুখীনতায় সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হয় তাও জানিনা। আবার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারিনা বলে মানুষকে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির ধাঁচে শুধু উৎপাদনের শ্রমিক ছাড়া উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ হিসেবে ভাবতে পারি না। এর ফলেই আমাদের বর্ধিত হারে বৈদেশিক ঋণের কথা ভাবতে হয় এবং অসহায়ভাবে বৈদেশিক বিশেজ্ঞদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। এ সুযোগে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞরা অনুন্নত দেশের বুদ্ধিজীবিদের নানা ভাবে কিনে ফেলতে চেষ্টা করেন এবং তাদের চোখে রংগীন চশমা পরিয়ে দেন।

অনুন্নত দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবিরা কিছুটা নিজেদের স্বার্থের জন্য ও কিছুটা তাদের অসহায়তার জন্য এ অবস্থার পরিবর্তন সহজে করতে পারবে না। তবে যদি তারা গ্রামীণ পর্যায়ে সচেতনতা ও সংগঠন সৃষ্টির কাজে সাহায্য করতে পারে তবে গ্রামে নূতনতর মানব সম্পদের সৃষ্টি হবে এবং তখন তারা দেখতে পাবে যে গ্রামে অজস্র সম্পদ রয়েছে যা নিয়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। সুতরাং আমাদের নূতন পরিকল্পনার চতুর্থ অধ্যায় হবে সেই সব বুদ্ধি-জীবিদের চোখ থেকে রংগীন চশমা খুলে নেওয়া, যাতে তারা ইনপুট আউটপুট কো-ইফিসিয়ন্টের দুর্বল বেড়া ডিংগীয়ে গ্রামের মানুষগুলোকে দেখতে পায় ও তাদের যৌথমুখীনতাকে আরও বেশী সচেতন ও সংগঠিত করার প্রয়াস পায়।

গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করা ছাড়া অনুন্নত দেশে উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে সব অনুন্নত দেশ প্রধানতঃ গ্রামীণ সেখানে গ্রামের মানুষকে প্রথমে সংগঠিত করা দরকার। এ কাজটি করার জন্য এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী রয়েছে। তারা যৌথমুখীনতায় উদ্বুদ্ধ। তারা গতানুগতিক নেতৃত্বের বিরোধিতাকে এবং গতানুগতিক প্রশাসনের অনীহাকে অতিক্রম করে উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তারা গতানুগতিক প্রশাসক ও নেতাদের যৌথমুখী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যবহারিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবারও ক্ষমতা রাখে। আমরা কি আমাদের এই আত্ম-শক্তির বিকাশের চেষ্টা করবো না আমাদের আত্ম-শক্তির ক্রমাগত অবক্ষয়ের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়নে আমাদের মনমানসিকতাকে বিদেশী ধ্যানধারণা গ্রহণে আরও উন্মুক্ত করবো ? কাঠামোগত পরিবর্তন না আনতে পারলেও কি করে সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আত্মনির্ভর উন্নয়নে কিছুটা এগিয়ে যাওয়া যায় এ প্রবন্ধে আমরা আমাদের মাঠ পর্যায়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা ইংগিত দিলাম। তবে বলা বাহুল্য যে এ কার্যক্রম কাঠামোগত পরিবর্তনের কোন বিকল্প হতে পারে না।

টীকা

১। দেখুন ঃ Shaikh Maqsood Ali, "The Shanirvar (Self-Reliance) Movement in the 1980s-the Social worker as Change Agents," *Administrative Science Review*, (June 1979).

২। এ ধরনের বিশ্লেষণের জন্য দেখুন ঃ Shaikh Maqsood Ali, 'Social Development in the Third World Countries : Lessons from Experience, *Administrative Science Review*, (1982).

৩। বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

৪। দেখুন ঃ Shaikh Maqsood Ali, "The Own Village Development Programme in Bangladesh ; An Experiment in Bottom-up-Planning.", *Administrative Science Review*, (March-June 1981).

৫। দেখুন ঃ Shaikh Maqseod Ali. "The Batasan-Durgapur Format for Rural Development in Bangladesh' *Rural Development Participation Review* (Spring 1981), Coruece University, New York. Reprinted in Voluntary Action, Association of Voluntary Agencies for Rural Development (AVDRD), Feb 1982.